সুষম উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার
মর্যাদাকর বাংলাদেশ

শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিকের অধিকার
ন্যায্য হিস্যা

জাতীয় সংসদ নির্বাচন- ২০২৬ এ রাজনৈতিক দলসমূহের ইশতেহারে অন্তর্ভুক্তি এবং জাতীয়ভাবে শ্রম ইস্যুতে রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে

‘শ্রমিক ইশতেহার’

শ্রমিক অধিকার জাতীয় এডভোকেসি এলায়েন্স

(জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও শ্রমিক অধিকার সংগঠনসমূহের যৌথ প্লাটফরম)

শ্রমিকের মর্যাদা, অধিকার ও সুরক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে

শ্রমিক ইশতেহার

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ সুদীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্নভাবে বঞ্চনা, শোষণ ও বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছে, যা সমাজের এগিয়ে যাওয়া, রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে সচল করা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও একটি মর্যাদাকর বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে সবসময় বাধা হয়ে থাকে। এই বৈষম্য নিরসন, তাদের শোষণ মুক্তি, অধিকার সুরক্ষা এবং ন্যায্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তার লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষ এ দেশের আপামর জনগণের সাথে ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬৬ ও ৬৯-এর গণআন্দোলন, ৯০ ও ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে জীবন দিয়েছে এবং ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, রক্ত দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে। গত দেড় দশকে ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনেও শত শত শ্রমিকের রক্তদানের বিনিময়ে তারা এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের অংশীদার হয়েছে।

এর ফলশ্রুতিতেই আজ বাংলাদেশ পরিবর্তনের এক নতুন দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেবল ক্ষমতা বদলের নির্বাচন নয়, আগামী নির্বাচন জাতীয়জীবনে দীর্ঘদিনের যে বৈষম্য, অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, মানুষকে বঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা, লুটপাটের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করা, বি-শিল্পায়ন প্রক্রিয়া, বিদেশনির্ভর শিল্পায়ন-এসব থেকে মুক্তির মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার পূরণের একটি বড় সুযোগ হিসেবে সামনে এসেছে। শ্রমক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য, বঞ্চনা ও নিরাপত্তাহীনতা বিমোচন না করে সমাজে বৈষম্য দূর করা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার এবং তা অর্জনের জন্য দীর্ঘদিনের যে সংগ্রাম তার সফল সমাপ্তির জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বশীল ভূমিকা এবং সকলের সমন্বিত ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি।

শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা একটি রাজনৈতিক দায়িত্ব এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে সেই সুযোগও আজ তৈরি হয়েছে। আগামী নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন পূরণ হতে পারে কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছার মাধ্যমেই। সবার জন্য একটি মর্যাদাকর ও ন্যায্য বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সর্বাগ্রে চাই রাজনৈতিক অঙ্গীকার যার নেতৃত্বে রয়েছে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো। রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের জন্য একটি ন্যায্য বাংলাদেশ গড়ে তোলার কাজ শুরু করা এখনই প্রয়োজন।

বাংলাদেশের সমাজে বৈষম্যের যে বীভৎস অবস্থান তার একটি বড় ক্ষেত্র হচ্ছে শ্রম ক্ষেত্র। সাড়ে সাত কোটি শ্রমজীবী মানুষের এই দেশে প্রায় ৮৫% শ্রমিকই অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। সিংহভাগ শ্রমিকেরই নেই আইনী স্বীকৃতি, নির্দিষ্ট মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তা; ফলে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন ন্যায্য প্রাপ্য থেকে। শ্রমিকের সংগঠিত হওয়ার ও দরকষাকষির অধিকার না থাকায় ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্য থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন, ব্যাহত হচ্ছে শিল্পসম্পর্ক। ন্যূনতম নাগরিক সেবার ব্যবস্থা না করেই গড়ে তোলা হচ্ছে শিল্পাঞ্চল। সরকারের অদূরদর্শী ও ভ্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে ঐতিহ্যবাহী ও প্রতিষ্ঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠান বন্ধ হচ্ছে ক্রমাগত। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় শ্রমিকের প্রাণ যাচ্ছে, অথচ বিচার নেই এসব অবহেলাজনিত মৃত্যুর, ক্ষতিপূরণের পরিমাণও অযৌক্তিকভাবে কম। বৈষম্য বাড়ছে মজুরি, মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ অনেক ক্ষেত্রে। অভিবাসী শ্রমিক, নারী শ্রমিক, আদিবাসী শ্রমিক, প্রতিবন্ধি শ্রমিক বঞ্চিতদের মধ্যেও আরও বেশি বঞ্চিত। জাতীয় পর্যায়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়নি আজও। ট্রেড ইউনিয়নের অবাধ ও কার্যকর বিকাশ এবং যৌথ দরকষাকষির সুস্থ চর্চা বিভিন্নভাবে সংকুচিত। রাষ্ট্র ও সমাজে শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিকের মর্যাদা আজ কথার কথা মাত্র। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে সস্তা শ্রমের দেশ হিসেবে।

শ্রমিকরা নিজেদের কাজ নিজেরাই খুঁজে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। কর্মবাজারে নতুন নতুন শ্রমখাত তৈরি হচ্ছে। ডিজিটাল প্লাটফর্মে ফ্রিল্যান্সিং, পরিবহণ, খাবার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ ইত্যাদি খাতে লক্ষ লক্ষ যুবক কাজ করছেন কোনও ধরনের আইনগত সুরক্ষা ছাড়াই। আবার, বিদ্যমান বিপুলসংখ্যক বেকার ও অর্ধবেকারের এই দেশে প্রতিবছর নতুন করে ২২ লাখের বেশি শ্রমশক্তি কর্মবাজারে যুক্ত হচ্ছে। ফলে জীবিকা অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা চরম আকার ধারণ করেছে। এই পরিস্থিতিকে পুঁজি করে অনিবার্যভাবেই ব্যাপক শ্রমশোষণ চলছে; বর্ধিত যুব শ্রমশক্তির (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) সঠিক ব্যবহারে রাষ্ট্রের নেই কোনও পরিকল্পনা। অপরদিকে, দেশে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবে বিদেশে যাচ্ছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক যারা অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের তুলনায় কম মজুরিতে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজনক কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। বিদেশ থেকে প্রতিদিন দেশে ফেরত আসছে বাংলাদেশী শ্রমিক ভাইবোনদের লাশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি মেহনতী শ্রমজীবী মানুষের সকল প্রকার শোষণ মুক্তি। 'কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি' প্রসঙ্গে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪-এ অঙ্গীকার করা হয়েছে যে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে-এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।" সংবিধানে কর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কর্মক্ষম নাগরিকের অধিকার ও সম্মানের বিষয় হিসেবে (অনুচ্ছেদ ২০)। সংবিধানে নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা, যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থান, যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশ এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা

(অনুচ্ছেদ ১৫) এবং মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপে নাগরিকদের 'সুযোগের সমতা'র অঙ্গীকার করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৯); নিষিদ্ধ করা হয়েছে সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম (অনুচ্ছেদ ৩৪) এবং প্রত্যেক নাগরিককে দেওয়া হয়েছে সমিতি বা সংঘ গঠন করার অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩৮)। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার করা হয়েছিল। জুলাই ঘোষণাপত্রে শ্রমিক সংগঠনসমূহের অবদান স্বীকার করা হয়েছে এবং আইনের শাসন, মানবাধিকার, দুর্নীতি ও শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন এবং মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ অনেকগুলো আন্তর্জাতিক চুক্তি ও দলিলে স্বাক্ষরকারী পক্ষ; এসব চুক্তি ও দলিলের শর্তাবলি পূরণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দায়বদ্ধতা রয়েছে; বিশেষ করে করে আইএলও'র সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রম মান অনুসরণ ও সুরক্ষায় বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়াও, গত ২৫ বছর যাবৎ বাংলাদেশ আইএলও শোভন কাজ বাস্তবায়ন কর্মসূচিতে (Decent Work Country Programme) একটি অংশগ্রহণকারী দেশ। মানবাধিকার, নারী, শিশু, অভিবাসী, এলডিসি গ্রাজুয়েশন, ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতাসহ অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এসব বিষয়েও বাংলাদেশের রয়েছে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার। বাংলাদেশ আইএলও'র ১০টি কোর কনভেনশন অনুসমর্থন করলেও সেসব দলিলের আলোকে রাষ্ট্রীয় আইন যথাযথভাবে প্রণয়ন বা সংশোধন করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ মোতাবেক শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা এখনও বাধাহীন নয়, এক্ষেত্রে আইনগত সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে এখনও, আবার, কাঠামোগতভাবেও প্রক্রিয়াকে জটিল করে রাখা হয়েছে। ফলে, এখনও ৮০% এর অধিকসংখ্যক শ্রমিক সংগঠন করার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসডিজিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে গৃহীত বিষয়সমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন বাংলাদেশের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ভবিষ্যতে আমাদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অটোমেশন, এ.আই এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের চাকরিক্ষেত্রে অস্থিরতা ও অবনতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। দেশে আয়বৈষম্য তৈরি হয়েছে যার মূল কারণ হচ্ছে মজুরিবৈষম্য ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা।

ইতোমধ্যে আমরা কিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি, বিশেষত গার্মেন্টস ও নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। তবে সঠিক নীতি ও সহায়তার অভাবে তা টেকসই হচ্ছে না। বাংলাদেশ আজ এলডিসি (LDC) গ্রাজুয়েশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রানা প্লাজাসহ অন্যান্য দুর্ঘটনার কারণে বাংলাদেশ একদিকে তার সুনাম হারিয়েছে, অন্যদিকে

একর্ড, এলায়েন্সসহ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গার্মেন্টস শিল্পে নিরাপত্তা উন্নয়নে ইতিবাচক উদাহরণও তৈরি করেছে। তবে, একই ধরনের উদাহরণ আমরা অন্যান্য শিল্প ও শ্রমক্ষেত্রে তৈরি করতে পারিনি। এই পরিস্থিতিতে, আমরা মনে করি আগামী দিনে আমাদের শ্রমক্ষেত্রে আরও সংস্কারের প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্যোগে গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশন ঐকমত্যের ভিত্তিতে 'শ্রমজগতের রূপান্তর রূপরেখা' শীর্ষক একটি সুপারিশমালা সরকারের কাছে জমা দিয়েছে এবং সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণ-পূর্বক সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আবার, বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী 'শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ- স্কপ' ৯ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে।

এই প্রেক্ষিতে আমরা, **'শ্রমিক অধিকার জাতীয় এডভোকেসি এলায়েন্স'** দেশের শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহ, শ্রমিক সংগঠনসমূহ ও তাদের বিভিন্ন জোট, শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ, শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ এবং স্কপ-এর ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানাচ্ছি এবং প্রত্যাশা করছি যে, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে শ্রমজীবী মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে নির্বাচিত সরকার নিম্নোক্ত সকল সুপারিশ বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

প্রস্তাবনাসমূহঃ

১। শ্রম আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে সকল শ্রমিকের আইনি স্বীকৃতি, নিবন্ধন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করাঃ

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি, গৃহভিত্তিক, অভিবাসী, আউটসোর্সিং, স্বনিয়োজিত ও সেবাখাতের শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকের জন্য আইনী স্বীকৃতি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সকল শ্রমিকের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র এবং স্বনিয়োজিত শ্রমিকের জন্য পরিচয়পত্র প্রদান নিশ্চিত করা।

(গ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, স্ব-নিয়োজিতসহ সকল শ্রমিকের পেশাগত ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জরুরি ভিত্তিতে 'জাতীয় শ্রমশক্তি নিবন্ধন ব্যবস্থা ও তথ্য ভাণ্ডার' গড়ে তোলা।

২। শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের অধিকার ও সুযোগঃ

(২.১) মৌলিক চাহিদাপূরণ, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করাঃ

(ক) সংবিধানের মূলনীতি অংশে ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা, যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থান, যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশ এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারকে শ্রমিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি এবং তা বাস্তবায়নে একটি জাতীয়ভিত্তিক সমন্বিত ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

(খ) পাশাপাশি কাজের সর্বোচ্চ সময়সীমা, নিরাপদ কাজ, ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত ও অধিকার লঙ্ঘনে প্রতিকারের ব্যবস্থাসম্বলিত সর্বজনীন জাতীয় মানদণ্ড তৈরি করা।

(২.২) আউটসোর্সিং/দৈনিকভিত্তিক ও স্থায়ী কাজে অস্থায়ী নিয়োগ বন্ধ করাঃ

(ক) স্থায়ী পদে/কাজে অস্থায়ী নিয়োগ বন্ধ করা এবং চাকরির অপ্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, অস্থায়ী, এজেন্সিনির্ভর কিংবা আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(খ) ব্যাংক-বীমাসহ সরকারি-বেসরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত সকল প্রতিষ্ঠানে আউটসোর্সিং বন্ধ করা।

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দৈনিক নিয়োগ বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(২.৩) শ্রমজীবী মানুষের কাজের নিরাপত্তা ও জীবিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা:

(ক) কারখানা বন্ধ লে-অফ, ছাঁটাই যা কর্মসংস্থানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং জাতীয় শ্রম কমিশন (প্রস্তাবিত)/শ্রম প্রশাসনের পূর্বানুমতি গ্রহণে বিধান করা।

(খ) পুনর্বাসন ছাড়া রিক্সা, ব্যাটারি রিক্সা, ইজি বাইক, হকারসহ স্ব-নিয়োজিত শ্রমিক উচ্ছেদ না করা এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবিকার উপকরণ, যেমন- জেলেদের জাল, রিক্সাওয়ালাদের রিক্সা ইত্যাদি, ধ্বংস বা বিনষ্ট বন্ধ এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে নিয়োগকারীকে আইনের আওতায় আনতে আইনগত ও প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(গ) কর্মীদের সুস্থতা ও উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে সকল শিল্প, খাত, বিশেষায়িত শ্রম অঞ্চল, কর্মসংস্থানের ধরন, প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক, লাভজনক বা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে আইন অনুযায়ী ৮ ঘণ্টা কাজের সময় কার্যকর করা। যেসব কর্মস্থলে অতিরিক্ত কাজের সময় প্রয়োজন, সেগুলিকে ৮ ঘণ্টার শিফটে রূপান্তরিত করা।

(ঘ) কর্মহীন সময়ের জন্য পুনঃদক্ষতা (re-skilling) ও উচ্চতর দক্ষতা (up-skilling) -এ সম্পৃক্ত করে বিকল্প কাজের সুযোগ তৈরি করা। এই ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(২.৪) জবরদস্তিমূলক শ্রম, বাধ্যতামূলক শ্রম ও আধুনিক দাসত্ব নিরসনে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা:

(ক) জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমখাত যেখানে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথার অস্তিত্ব রয়েছে বা সম্ভাবনা রয়েছে সেই সকল খাত জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত করা। শ্রম খাতসমূহকে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথা থেকে মুক্ত করতে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে কার্যকর জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

(খ) বাংলাদেশ শ্রম আইনে সুনির্দিষ্টভাবে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথার সংজ্ঞায়ন করা এবং উপযুক্ত শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা।

(গ) রপ্তানিমুখী শিল্পে এবং এর অপ্রাতিষ্ঠানিক সরবরাহকারী বা সাপ্লাই চেইনের পরোক্ষ সরবরাহকারীদের চিহ্নিত করে সকল ধরনের জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথার বিলুপ্তি নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পরিদর্শন চেকলিস্টকে আধুনিক দাসত্ব পরিমাপক মাপকাঠির আলোকে হালনাগাদ করা।

(২.৫) কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা:

(ক) দেশে বিরাজমান বেকারত্ব রোধ এবং দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রসারে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি, ২০২২ হালনাগাদ করা এবং শ্রমশক্তির সঠিক ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নসহ কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(খ) অটোমেশন ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং উদ্ভুত সুযোগ কাজে লাগাতে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরির লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পথনকশা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া; এক্ষেত্রে, শ্রমের যথাযথ ব্যবহার, উৎপাদনশীল যুব শ্রমশক্তি ও উদ্যোক্তা তৈরিতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

(গ) শ্রমঘন শিল্পের প্রসার, শিল্পে ও পণ্যে বৈচিত্রকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন এবং ঐতিহ্যবাহী গৃহভিত্তিক ও পারিবারিক শিল্প রক্ষা এবং দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ এবং এসব শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

(ঘ) দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং সকল ধরনের সরকারি-বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদেশি ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম বাধ্যতামূলক করা।

(ঙ) সকল প্রকার সরকারি প্রণোদনা/কর রেয়াতের সাথে কর্মসংস্থানকে সম্পর্কিত করা।

(চ) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও ব্যবসায়ী সংগঠন এবং শ্রমিক সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(ছ) শিল্প পরিচালনা, বৈশ্বিক ব্যবসা পরিচালনা ও দরকষাকষির দক্ষতা গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

(২.৬) জাতীয় শিল্পের বিকাশ এবং রাষ্ট্রীয় শিল্পখাত পুনর্জীবিত ও গতিশীল করা:

(ক) বন্ধকৃত রাষ্ট্রীয় পাটকল, চিনিকল, স্টিলমিল, হার্ডবোর্ড, টেক্সটাইলসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো চালুর উদ্যোগ নেয়া। শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ এবং তাদেরকে সম্পৃক্ত করে পাটকল, চিনিকলসহ অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা এবং ট্যানারিসহ সম্ভাবনাময় শিল্পসমূহ পরিকল্পিতভাবে আধুনিকায়ন করার উদ্যোগ নেয়া।

(খ) শিল্প, উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান নীতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ এবং রাষ্ট্রীয় শিল্প বন্ধ হওয়ার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে শ্বেতপত্র প্রণয়ন করা।

(গ) ইজারা প্রদান বাতিল করে পাটকলসহ সকল বন্ধ সরকারি কারখানা পুনরায় রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে চালুর ব্যবস্থা করা। বন্ধ কারখানাগুলিকে এলাকার প্রয়োজন ও আর্থ-সামাজিক বিবেচনায়, স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক বহুমুখী শ্রমঘন শিল্পে রূপান্তরে

কার্যকর পদেক্ষপ গ্রহণ করা যেন কারখানার কর্মহীন শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যায়।

(ঘ) পাটকলগুলিতে পুনরায় উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা ও কার্যকর পরিচালনার লক্ষ্যে বিগত দিনে ট্রেড ইউনিয়ন, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়েছে, সেগুলি পর্যালোচনা করে দেশের পাটশিল্প ও পাটচাষকে টেকসই করার লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। ট্যানারি, ফুটওয়্যার, কৃষিভিত্তিক, ফুল, ফল শিল্পের বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(ঙ) পাটকলসহ বন্ধ কলকারখানার শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কর্মক্ষম সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ/বিকল্প প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মচ্যুত শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

(২.৭) 'Apprenticeship' বা শিক্ষাধীনতা কর্মসূচি ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন করাঃ

শ্রম বাজারে প্রবেশের আগে এবং পরে শ্রমশক্তির জন্য ক্যারিয়ার সহায়তাসহ 'Apprenticeship' বা শিক্ষাধীনতা কর্মসূচি ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন করা। এই প্রক্রিয়ায় উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা।

(২.৮) টেকসই শিল্পায়ন, উৎপাদনশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করাঃ

জাতীয় শিল্পের বিকাশ, শিল্পায়ন ও টেকসই ও শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠাসহ উদ্যোক্তা গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক ও পরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্য আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্ক ফোর্স গঠন এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা। বিনিয়োগ নীতিতে কৃষিখাতকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৩। সকল শ্রমিকের জন্য মর্যাদাকর ও জীবনবিকাশের উপযোগী ন্যায্য মজুরিঃ

(৩.১) জাতীয়, খাত এবং পেশাভিত্তিক মজুরি নিশ্চিত করাঃ

(ক) মজুরিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ন্যায্য মজুরিকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিশ্চিত করা।

(খ) শ্রমিক ও তার পরিবারের মর্যাদাকর ও জীবনবিকাশের উপযোগী মজুরির অধিকার নিশ্চিতে জাতীয় ও খাতভিত্তিক ন্যূনতম মজুরির আইনি মানদণ্ড স্থির করা এবং জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে

মর্যাদাকর জীবন ও জীবনবিকাশের উপযোগী মজুরি/বেতনের (living wage) ধারণাকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা।

(গ) জাতীয় ন্যূনতম মজুরিকে ভিত্তি হিসেবে রেখে কাজের প্রকৃতি, খাতভিত্তিক চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ, ঝুঁকি এবং অঞ্চলভেদে বৈচিত্র্য বিবেচনায় বিশেষ খাত ও পেশার জন্য পৃথক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা।

(ঘ) সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি প্রতি তিন বছর পরপর মূল্যায়ন ও পুনর্নিরর্ধারণ করা এবং প্রতি বছর সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি মূল্যস্ফীতি, প্রাসঙ্গিক পরিষেবা ব্যয় ও জীবনযাত্রার মান বিবেচনায় সমন্বয় করা।

(ঙ) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন (নং ১৩১) দ্রুত অনুসমর্থন করা।

(৩.২) মজুরিবৈষম্য দূর করাঃ

(ক) মজুরি কাঠামোয় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে ভারসাম্য নিশ্চিত করা।

(খ) সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে মজুরিবৈষম্য কমানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(গ) নারী, পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও আদিবাসীসহ সকল শ্রমিকের জন্য সমান মজুরি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা।

(ঘ) পিসরেট বা ঠিকা ভিত্তিক কাজের মজুরি এমনভাবে নির্ধারণ করা, যাতে আট ঘণ্টার কাজের বিনিময়ে একজন কর্মী কমপক্ষে ন্যূনতম মজুরির সমান আয় নিশ্চিত করতে পারেন।

(৩.৩) বাধ্যতামূলক আপদকালীন তহবিল ও মজুরি বীমাঃ

(ক) সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য একটি আপদকালীন তহবিল গঠন করা, যেখানে নিয়োগকারী কারখানা/প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ২ মাসের মজুরি/বেতনের সমপরিমাণ টাকা উক্ত তহবিলে জমা রাখবে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, ব্যবসায় আকস্মিক সংকটের কারণে শ্রমিকের মজুরি ও অন্যান্য প্রাপ্তি লাভ এবং উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক জরুরি ও আপদকালীন তহবিল গঠন করা। এছাড়া, বকেয়া মজুরির ক্ষেত্রে শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(খ) জাতীয় মজুরি নিশ্চয়তা বীমা স্কিম চালু করা, যাতে করে কোনো প্রতিষ্ঠান মজুরি প্রদানে ব্যর্থ হলে কিংবা কোনও শ্রমিক ছাঁটাই হলে এই বিমার আওতায় মজুরি পরিশোধ করা যায়।

৪। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ এবং ক্ষতিপূরণঃ

(৪.১) প্রত্যেক শ্রমজীবী মানুষের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাঃ

(ক) সকল শ্রমিকের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ এবং স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার আইনি অধিকার নিশ্চিত করা।

(খ) আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে মিল রেখে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক একক ও সেক্টর ভিত্তিক জাতীয় মানদণ্ড (National OSH Standard) এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

(গ) অবহেলাজনিত কারণে দুর্ঘটনা হলে মালিকের সর্বোচ্চ শাস্তি ও জরিমানার ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কর্তব্যে অবহেলার জন্য শাস্তির আওতায় আনা।

(ঘ) এআই, ডিজিটালাইজেশন, অনলাইন প্লাটফর্ম, অতিমারী-কোভিডসহ যেকোনো সংক্রামক রোগ, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদ করা।

(ঙ) 'জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেফটি কাউন্সিল'কে কার্যকর করার জন্য একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনে সেক্টর ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে যুক্ত করা।

(চ) বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ/বিভাগের কাজের সমন্বয় এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, আইন ও বিধিমালা, কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) বাস্তবায়ন ও তদারকি করার জন্য Occupational Safety and Health Administration/ Authority প্রতিষ্ঠা করা।

(ছ) দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, বয়লার অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(জ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের জন্য এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং শ্রমঘন এলাকায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন করা যেখানে শ্রমিকরা তাদের সুবিধা ও সময় অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে পারে।

(ঝ) সকল জেলার শিল্প অঞ্চলে এবং সরকারি ও বেসরকারি বড় বড় হাসপাতালে পেশাগত রোগব্যাধির জন্য বিশেষায়িত OSH ইউনিট বা ক্লিনিক স্থাপন করা।

(ঞ) মেডিকেল শিক্ষায় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। চিকিৎসক, নার্স ও মেডিকেল টেকনিশিয়ানদের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা একাডেমিক কারিকুলাম যুক্ত করা।

(ট) শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রগুলিকে আধুনিকায়ন করা এবং চিকিৎসক, জনবল ও যন্ত্রপাতি প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, পেশাগত রোগব্যাধি ও কাউন্সেলিং চিকিৎসা এবং ন্যায্য মূল্যে ঔষধের ব্যবস্থা করা।

(ঠ) বাংলাদেশের সমস্ত শিল্পকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় নিয়ে নিরপেক্ষ, স্বাধীন, তদন্ত কমিটি গঠন এবং সঠিক ও বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

(ড) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের অধীনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা এবং কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার গঠন করা।

(ঢ) শ্রমিকদের পেশাগত রোগ চিহ্নিত করার জন্য একটি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা।

(৪.২) কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা:

শ্রম আইনে বর্ণিত বর্তমান ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপ্রতুল বিধায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে একটি সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করা এবং একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে আইএলও কনভেনশন ১২১ ও রানা প্লাজা ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা বিষয়ে হাইকোর্ট কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণে মানদণ্ড নির্ধারণ করা।

(৪.৩) দুর্ঘটনার বিচার, তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ:

(ক) বিভিন্ন সময়ে দুর্ঘটনার বিচার, তদন্ত প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ এবং ঐ সকল প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(খ) কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।

৫। সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ:

(৫.১) সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা:

(ক) সকল শ্রমিকের সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার প্রাপ্তির (কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, মৃত্যু, কর্মঅক্ষমতা, অসুস্থতা-অবসর, মাতৃত্বকালীন সুবিধা বা যেকোনো প্রতিকূল অবস্থা) সুযোগ নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(খ) শ্রমিকদের কর্মজীবন, অবসরকাল ও ভবিষ্যতের সুরক্ষা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত করতে 'অধিকার ও জীবন-চক্র ভিত্তিক' সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং এ লক্ষ্যে সকল শ্রমিকের (প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্বনিয়োজিত, কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত) জন্য একটি সমন্বিত সামাজিক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, সামাজিক বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল গঠন করা যেখানে নিয়োগকারী, সরকার ও শ্রমিকরা সামর্থ্য অনুযায়ী যৌথভাবে অবদান রাখবে।

(গ) জাতীয় পেনশন স্কিমের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য কারখানা/প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে শ্রমিক-বান্ধব স্কিম চালু করা এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/কারখানারকে সরকার কর্তৃক বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা। জাতীয় পেনশন স্কিমে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি ও যৌথ-অবদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ানোর জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(ঘ) জাতীয় বাজেটে মৌসুমি ও বেকার শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা এবং কর্মহীনতাকালীন সময়ে ভাতা (বেকারভাতা) প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(৫.২) শ্রমজীবী মানুষের জন্য রেশন, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবাসহ সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা:

(ক) গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবী মানুষের জন্য ভর্তুকিমূল্যে রেশন ও পর্যায়ক্রমে সকলের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা। রেশনিং ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত বড় বড় সকল শহর, কারখানা ও শিল্পঘন এলাকায় টিসিবির মাধ্যমে স্থায়ী ন্যায্যমূল্যের দোকান ও 'ওএমএস'-এর মাধ্যমে শ্রমিকদের পণ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

(খ) দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার পর শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা ও দীর্ঘমেয়াদি ভাতা নিশ্চিত করা। প্রতিবন্ধী ও দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের জন্য আজীবন চিকিৎসা, ভরণপোষণ এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থা প্রদান।

(গ) নারী শ্রমিকদের জন্য শিল্প ও শিল্পাঞ্চলভিত্তিক ডরমিটরি ও ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা।

(ঘ) প্রতিটি শিল্পাঞ্চলে শ্রমজীবীদের জন্য ডায়াগনস্টিক সেবাসহ হাসপাতাল স্থাপন করা। শ্রমিকের প্রয়োজন বিবেচনায় হাসপাতালসমূহে বিনামূল্যে সান্ধ্যকালীন সেবা চালু করা।

(ঙ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য 'শ্রমিক স্বাস্থ্য কার্ড' চালু করা, যা তাদের স্বাস্থ্য তথ্য ও প্রাপ্য সুবিধাদি গ্রহণে সাহায্য করবে। পাশাপাশি, ২৪ ঘণ্টা 'টোল ফ্রি' টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা, যাতে শ্রমিকেরা যে কোনো সময় স্বাস্থ্য পরামর্শ নিতে পারেন।

(চ) সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন (নং ১০২) দ্রুত অনুসমর্থন করা।

(৫.৩) শিল্পাঞ্চল ও শ্রমঘন এলাকায় নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র চালু করা:

(ক) শ্রমিক ও তার পরিবারের জন্য শিল্পাঞ্চলে নাগরিক সুবিধা ও সেবা, যেমন- শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যবীমা, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, গ্যাস বিদ্যুৎ-পানির যথাযথ সরবরাহ ও অন্যান্য নিশ্চিত করা।

(খ) শিল্পাঞ্চলগুলোতে আধুনিক সুবিধাসম্বলিত শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

(৫.৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে কার্যকর ও সহযোগিতার পরিসর বিস্তৃত করা:

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করা। শ্রমিকদের আবেদন করার প্রক্রিয়া আরও সহজ করা। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নারী শ্রমিক, প্রতিবন্ধী শ্রমিকসহ নির্দিষ্ট শ্রমজীবী গোষ্ঠীর জন্য সহযোগিতামূলক কার্যক্রম চালু করা। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে শ্রমিকদের জানানোর জন্য ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করা।

৬। সংগঠনের অধিকার ও যৌথ দরকষাকষি:

কাজের ধরন, নিয়োগ, পদবি যাই হোক না কেন বাংলাদেশের সংবিধান এবং আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিকের সংগঠন করা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা।

সকল শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের সংগঠন করা ও দরকষাকষি অধিকার নিশ্চিত করা:

(ক) ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও নিবন্ধনের শর্ত শিথিল করে সংগঠন করা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার বিস্তৃত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান শ্রম আইন সংশোধনসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। শ্রমিকদের সংগঠন করার এবং দাবি উত্থাপন ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা দূর করা।

(খ) দরকষাকষির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক কাঠামো নিশ্চিত করা। স্ব-নিয়োজিতসহ সকল শ্রমজীবী মানুষ যেন তাদের সমস্যা সমাধান ও বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য দরকষাকষি করতে পারে তার কাঠামো তৈরি করা।

(গ) আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর আলোকে স্বাধীনভাবে সংগঠন, পছন্দমত নেতা নির্বাচন, কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন এবং দরকষাকষি করার অধিকার নিশ্চিত করা।

(ঘ) ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। বিভিন্ন সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে যে সকল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও শ্রমিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে তা দ্রুত পর্যালোচনা সাপেক্ষে বাতিল করা।

৭। শিল্পসম্পর্ক চর্চা ও উন্নয়ন, নীতি প্রণয়নে শ্রমিকের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব এবং শ্রম আইন অনুযায়ী জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম গঠন:

(৭.১) সুসমন্বিত শিল্প সম্পর্ক ও সামাজিক সংলাপ চর্চা:

(ক) সুসমন্বিত-সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে শ্রমিক-নিয়োগকারীসহ সকল পক্ষের দায়িত্বশীল আচরণ এবং কার্যকর সংলাপের কাঠামো ও প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

(খ) বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এ বর্ণিত জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম গঠন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা।

(৭.২) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বে নারী-পুরুষ শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা:

(ক) শ্রম সংশ্লিষ্ট নীতি, বাৎসরিক বাজেট, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জনসহ বিভিন্ন জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নারী-পুরুষ উভয় শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(খ) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল কর্তৃক শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন এমন ব্যক্তিদের মনোনয়ন প্রদান করা।

(গ) সকল প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে/ফোরামে সংঘবদ্ধ শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতে সরকারের নীতি প্রণয়ন করা।

(৭.৩) জাতীয় শ্রম সংক্রান্ত পরামর্শ কমিটি গঠন করা:

শ্রমিক, নিয়োগকারী ও শ্রমখাতে অভিজ্ঞ/বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে একটি পরামর্শ, পর্যালোচনা ও মনিটরিং কমিটি গঠন করা। শ্রমখাতের দুটি প্রধান অংশীদার, শ্রমিকপক্ষ ও নিয়োগকারীপক্ষের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান, যোগাযোগ ও সমন্বয়, পর্যালোচনা, দিক নির্দেশনা, কল্যাণমূলক কার্যক্রম মনিটরিং, সেবা প্রদানকারী অধিদপ্তর সম্পৃক্ত কোনো অভিযোগ পর্যলোচনাপূর্বক মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ প্রদান ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবে এই কমিটি।

(৭.৪) ত্রিপক্ষীয় কার্যক্রম ও কাঠামোসমূহ জোরদার করা:

জাতীয় ও খাতভিত্তিক ত্রিপক্ষীয় কার্যক্রমে প্রতিনিধি মনোনয়নে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং তাদের সুপারিশ অনুসরণ করা।

৮। শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এবং ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিতে অভিযোগ জানাতে প্রশাসনিক ও বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ:

(ক) শ্রমিকের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, ভার্চুয়াল শুনানি, মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি এবং শ্রমিকদের বিনামূল্যে আইন সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সরকার কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া। আইনগত অধিকার লঙ্ঘন প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও কাঠামো নিশ্চিত করা।

(খ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে (শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিতে অভিযোগ নিষ্পত্তি ও সহায়তা ডেস্ক চালু করা।

(গ) শ্রম আদালত, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল থেকে হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগ পর্যন্ত সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রচলন করা।

৯। সমতা, বৈষম্যহীনতা এবং অন্তর্ভুক্তি:

(৯.১) সম-অধিকার নিশ্চিত এবং সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করা:

(ক) নারী-পুরুষ, অন্যান্য লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠীভেদে নিয়োগ, মজুরি, পদোন্নতি, ট্রেড ইউনিয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াসহ শ্রমখাতের সর্বত্র 'বৈষম্য নয়-সমঅধিকার' নিশ্চিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা। পাহাড়ে-সমতলে, গ্রাম-শহরে সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক, প্রতিবন্ধিসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।

(খ) সকল ধরনের বৈষম্যমূলক কাজ চিহ্নিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের জন্য সমমানের কাজে সমমজুরি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নীতিমালা পর্যালোচনা ও সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া। পিসরেট ও ঠিকা কাজের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের শারীরিক সক্ষমতার স্বাভাবিক পার্থক্যকে ও নারীর আইনানুগ সুবিধা যেমন ওজন বহনের ক্ষেত্রে ছাড়, পিস রেটের টার্গেট, গর্ভকালীন সময়ে হাল্কা কাজের অধিকারকে বিবেচনায় রেখে সমমজুরি নির্ধারণ করা।

(ঘ) নারীদের বেতনহীন সেবা কাজকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে 'কাজ' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এই কাজের জেন্ডারভিত্তিক বিভাজন দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

(ঙ) কর্মক্ষেত্র, যাতায়াতের পথ এবং জনাকীর্ণ স্থানে যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তিদের জন্য কার্যকর অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। পাবলিক প্লেস ও শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ (যেমন- সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং কমিউনিটির সহায়তা কাঠামো গড়ে তোলা) করা।

(চ) আন্তর্জাতিক শ্রম কনভেনশনগুলোর নির্দেশনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি দেশের দলিত শ্রমিকদের সামাজিক বঞ্চনা কমাতে বৈষম্য বিরোধী আইন দ্রুত পাশ করা।

(৯.২) যৌন হয়রানিসহ সকল ধরনের হয়রানি ও সহিংসতা প্রতিরোধ এবং নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা:

(ক) কর্মক্ষেত্রে ও চলাচলের পথে শ্রমজীবীদের প্রতি সকল ধরনের হয়রানি ও সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(খ) শ্রম আইন ও ২০০৯ সালের হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতা বিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন, জরুরিভাবে অভিযোগ সেল ও নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা। পাশাপাশি নির্দেশনাসমূহ পরিপালন নিশ্চিত করতে একটি তদারকি কমিটি গঠন করা।

(গ) রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসমর্থনকৃত আইএলও কনভেনশন (নং ১৯০)-এর নির্দেশনা পরিপালনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং গৃহশ্রমিক সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন (নং ১৮৯) দ্রুত অনুসমর্থন করা।

(ঘ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত খসড়াকৃত "কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন" দ্রুত পাশ করা।

(ঙ) নারীবান্ধব ও বৈষম্যহীন শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "শূন্য সহনশীল নীতি" অনুসরণ করা।

(চ) নারী শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা এবং কর্মক্ষেত্রে পৃথক বিশ্রামাগার ও টয়লেটের ব্যবস্থা করা।

(৯.৩) সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং সকল নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি সবেতনে ৬ মাসে উন্নীত করা:

(ক) সকল নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি সবেতনে ৬ মাসে উন্নীত করা এবং এ জন্য প্রয়োজনে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকার কর্তৃক সহায়তা প্রদান করা; অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ স্কিম প্রণয়ন করা।

(খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নারী, শিশু ও কল্যাণ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় করা।

১০। শিশু শ্রম ও কিশোর শ্রমিক:

শিশু-কিশোর শ্রম বন্ধে সরকার কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা:

(ক) ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য মর্যাদাবান নাগরিক ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে কর্মে নিযুক্ত হওয়ার বয়স সর্বনিম্ন ১৬ বছরে উন্নীত করা এবং ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সের কিশোরদের এমন ধরনের কাজে নিয়োগ করা যেখানে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সৃজনশীলতা বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ থাকে।

(খ) অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ও শ্রমজীবী পরিবারের শিশুদের জন্য কমপক্ষে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্য বই ছাড়াও সব ধরনের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে বিনা খরচে মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা।

(গ) কিশোর শ্রমগোষ্ঠীর জন্য সহজলভ্য ও মানসম্পন্ন কর্মমুখী কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ নিশ্চিত করে দক্ষতাভিত্তিক শ্রম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা।

(ঘ) শিশুদের মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, বৈষম্য করা, অবহেলা করা, অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে শিশুদের অধিকার হরণ করা বা শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনে বাধাগ্রস্ত হয় এমন ধরনের কাজ বা শিশুর অধিকার লঙ্ঘনজনিত যেকোনো কারণ প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির বিধান করা।

(ঙ) সকল শিল্পে নিজেদের কারখানার পাশাপাশি তাদের সাপ্লাই চেইনে যুক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পণ্য ও সেবা সরবরাহকারীদের কারখানাও সম্পূর্ণরূপে শিশুশ্রম ও জবরদস্তিমূলক শ্রম মুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১১। শ্রম প্রশাসন, পরিদর্শন, জবাবদিহিতা:

(১১.১) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন করা:

(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় শ্রম সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত 'কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর' এবং 'শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করা।

(খ) শ্রমশক্তি জরিপ, শ্রম সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় আলাদা বিভাগ এবং অভিবাসী শ্রমিক অনুবিভাগ গঠন করা।

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেটে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণা-লয়ের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

(১১.২) শ্রম সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা এবং জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্ত অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা -সমন্বয় জোরদারে সরকারি (শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, কেন্দ্রীয় তহবিল, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শিল্প-সম্পর্ক শিক্ষায়তন-আইআরআই, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট- নসট্রি, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান) ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বত্র জবাবদিহিতা, গণতান্ত্রিক চর্চা, স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১২। জলবায়ু ও প্রযুক্তি পরিবর্তন, অটোমেশন ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে ন্যায্য রূপান্তর এবং সামাজিক, পরিবেশগত ও মানবাধিকার বিষয়ক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক দায়বদ্ধতা:

(১২.১) জলবায়ু ও প্রযুক্তি পরিবর্তন, অটোমেশন ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে ন্যায্য রূপান্তর:

(ক) বাংলাদেশের শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী ও তাদের পরিবারের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে জলবায়ু ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং পরিবেশবা-ন্ধব শিল্পে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ন্যায্য রূপান্তর নীতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি শ্রমবান্ধব জাতীয় জলবায়ু ন্যায্যতা কৌশলপত্র প্রণয়ন করা।

(খ) পরিবেশবান্ধব সবুজ অর্থনৈতিতে রূপান্তর বা শিল্পায়ন বা শিল্পে যে কোনো ধরনের প্রযুক্তিগত রূপান্তর প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এবং সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরের সুফল লাভের জন্য একটি জাতীয় ন্যায্য রূপান্তর কৌশল কাঠামো প্রণয়ন করা এবং একটি ন্যায্য রূপান্তর পরামর্শক পরিষদ গঠন করা।

(গ) জলবায়ু পরিবর্তন ও সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ও সামজিক সুরক্ষা নিশ্চিতে সরকারি ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে তহবিল গঠন করা।

(ঘ) জলবায়ু ও পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সেক্টরসমূহের অগ্রাধিকারি-ভত্তিক তালিকা তৈরি করা এবং উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে সকল পক্ষের সমন্বয়ে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশলপত্র প্রণয়ন করা।

(ঙ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভুত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকিসমূহ মূল্যায়ন করে তা থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

(চ) সবুজ রূপান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পুনর্বাসন, আপ-স্কিলিং ও রি-স্কিলিং নিশ্চিত করা।

(ছ) ন্যায্য রূপান্তর নীতিতে নারী শ্রমিকদের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নেওয়া। নারীদের প্রতি সংবেদনশীল ন্যায্য রূপান্তর নীতি নিশ্চিত করতে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নারী শ্রমিকদের প্রতিবন্ধকতা এবং প্রয়োজনের বিষয়গুলি বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে দক্ষতা উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(১২.২) আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ সংক্রান্ত নীতির আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ:

(ক) জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (UDHR), অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার চুক্তি (ICESCR), নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তি (ICCPR), এবং শিশু অধিকার সনদ (CRC) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মৌলিক কনভেনশনসমূহের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী শ্রমিক ও তার পরিবারের সকল অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(খ) জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক নির্দেশনা (UNGPs), বহুজাতিক কোম্পানি এবং সামাজিক নীতিমালা সম্পর্কিত আইএলও ত্রিপাক্ষিক ঘোষণা, বহুজাতিক কোম্পানির দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ সম্পর্কিত ওইসিডি নির্দেশিকা অনুসারে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ কার্যকর করা এবং প্রতিটি স্তরে অগ্রগতি দৃশ্যমান করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(গ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে শ্রমিক পক্ষের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ সংক্রান্ত একটি জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মানবাধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দায়িত্বশীল ব্যবসা পরিচালনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) প্রণয়ন করা।

(ঘ) জাতীয় শ্রম কমিশন প্রতিষ্ঠাপূর্বক এর অধীনে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স পর্যবেক্ষণ, অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার প্রদানের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা চালু করা।

(ঙ) শ্রমিক, কারখানা, সরবরাহকারী এবং অন্যান্য অংশীজনকে সঠিকভাবে শনাক্তকরণের ভিত্তিতে একটি জাতীয় পর্যায়ের বিস্তৃত সরবরাহ চেইন ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠা করা যা মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও নজরদারিতে সহায়ক হবে।

(চ) সকল বাণিজ্য ও রপ্তানি চুক্তিতে মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স অনুসরণের জন্য বাধ্যতামূলক সামাজিক শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা যাতে শ্রম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩। অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা:

(১৩.১) অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা:

সকল অভিবাসী শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিত ও অভিবাসন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ লক্ষ্যে, অভিবাসী শ্রমিকের স্বীকৃতি, সংগঠিত হওয়া এবং প্রতিনিধিত্বের অধিকার নিশ্চিত করা। একইসাথে দেশীয়-আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার করা।

(১৩.২) অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা:

(ক) বিদেশ গমনেচ্ছুদের সহজ শর্তে ঋণ, ফিরে আসা শ্রমিকদের পুনর্বাসন, প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী ও আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে দায়িত্ব প্রদান ও কার্যকর করা।

(খ) অভিবাসী শ্রমিকদের অভিবাসন ব্যয় কমাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(গ) অভিবাসী শ্রমিকদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন ও হয়রানি বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(ঘ) রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি, মধ্যসত্ত্বভোগী বা সাব-এজেন্টদেরকে কার্যকর মনিটরিং, কঠোর নজরদারি ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা।

(ঙ) অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য ‘ডিজিটাল কমপ্লেইন সিস্টেম’ প্রবর্তন করা যাতে অভিযোগকারীরা ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে অভিযোগের অবস্থা জানতে পারে।

(চ) সরকার কর্তৃক আন্তর্জাতিক অনুসমর্থনকৃত সনদ The UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families-1990 এর পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইএলও’র আর্ন্তজাতিক সনদ অনুসমর্থন করা।

(ছ) আইএমটি/টিটিসিসমূহে ভাষা ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ কোর্স প্রণয়ন করা এবং মান যাচাইয়ের জন্য নিয়মিত মূল্যায়ন করা।

(জ) দূতাবাস ও কনস্যুলার অফিসগুলিতে (লেবার উইংসহ) সেবা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও বাজেট বরাদ্দ দিয়ে সর্বস্তরে সেবা নিশ্চিত করা। এই কাজের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রম অভিবাসন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে প্রাধান্য দেওয়া; প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ব্যক্তিকে 'চুক্তিভিত্তিক' নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

(ঝ) অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিশেষ করে নারী শ্রমিকের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(ঞ) আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার গবেষণার জন্য বাজেট বরাদ্দ এবং তার ভিত্তিতে অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণসহ নিয়মিত পর্যালোচনা ও অগ্রগতি মূল্যায়ন করা।

(ট) অভিবাসী শ্রমিক সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন (নং ৯৭ ও ১৪৩) দ্রুত অনুসমর্থন করা।

১৪। ইপিজেড ও বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিক অধিকার, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের গুরুত্ব:

(১৪.১) সকল শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা:

যথাযথ ত্রিপক্ষীয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বর্তমান শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় ও মৌলিক সংস্কার সাধন এবং 'এক দেশে এক আইন' নীতিতে ইপিজেড, স্পেশাল ইকোনমিক জোনসহ সকল শিল্প ও শ্রমখাতকে শ্রম আইনের আওতায় আনা এবং সকল শ্রমিকের অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও দরকষাকষির গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা।

(১৪.২) শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নপূর্বক কর্মসংস্থানের পরিধি বৃদ্ধি করা:

ইপিজেড-এ বিদেশি কারখানাসমূহ যাতে প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং শ্রমিকরা আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

১৫। জাতীয় স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন:

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, জাতীয় পর্যায়ে কর্মক্ষেত্রে সংকট মোকাবেলা এবং জবাবদিহিমূলক শ্রম প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতের লক্ষ্যে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন করা।

আমরা দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাশা করি, রাজনৈতিক দলসমূহ উপরোক্ত প্রস্তাবনার পাশাপাশি শ্রম সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ সুপারিশ, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ -এর ৯ (নয়) দফা দাবিনামা, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম (এসএনএফ), গবেষণা

প্রতিষ্ঠানসহ শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা, উন্নয়ন ও কল্যাণে ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও প্লাটফরমসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে আগামী দিনে একটি মর্যাদাপূর্ণ বাংলাদেশ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে।

এ অভিযাত্রায় আমাদের অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সংযুক্তি- ১:

শ্রম সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রণীত 'শ্রমজগতের রূপান্তর রূপরেখা' শীর্ষক প্রস্তাবনার সামগ্রিক প্রতিফলন

১। সকল শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা ও স্বীকৃতি

প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি, গৃহভিত্তিক, অভিবাসী, স্বনিয়োজিত শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রম আইনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্যে, কাজের স্বীকৃতি ও পরিচয়পত্র, নিরবচ্ছিন্ন কাজ এবং আয়ের নিশ্চয়তা, মর্যাদাকর-শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে এবং চাকরির অপ্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, অস্থায়ী ও এজেন্সিনির্ভর নিয়োগের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ক) নিজের ও পরিবারের মর্যাদাকর জীবনযাপন উপযোগী ন্যায্য মজুরি (লিভিং ওয়েজ), উন্নয়নে ন্যায্য অংশীদারিত্ব ও হিস্যা প্রাপ্তির অধিকার;

(খ) প্রত্যেকের জন্য নিরাপদ কাজ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, দুর্ঘটনায় যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং নিজের ও পরিবারের সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার;

(গ) প্রত্যেকেরই অবসর, কর্মঅক্ষমতা, অসুস্থতা, মাতৃত্বকালীন বা যেকোনো প্রতিকূল অবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা প্রাপ্তি এবং কোনও না কোনও সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমে অন্তর্ভুক্তি;

(ঘ) প্রত্যেকের অধিকার সুরক্ষা ও ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সংগঠিত হওয়া, সমষ্টিগতভাবে প্রতিনিধিত্ব করার ও অধিকার লঙ্ঘনে অভিযোগ জানানো, প্রতিকার ও ন্যায়বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা;

এই অধিকারসমূহ নিশ্চিতকরণে, সরকার কর্তৃক দেশের সংবিধান, আইএলও কনভেনশন এবং কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা ও অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা, শোভন কাজের মানদণ্ড এবং মানবাধিকার ও ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার আলোকে যথাযথ ত্রিপক্ষীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে বর্তমান শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় ও মৌলিক সংস্কার অথবা একাধিক আইন প্রণয়ন করা, এবং কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২। মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় এবং খাতভিত্তিক মজুরি নিশ্চিতকরণ:

শ্রমিক ও তার পরিবারের মর্যাদাকর জীবনযাপন উপযোগী মজুরির অধিকার নিশ্চিতে জাতীয় ন্যূনতম মজুরির মানদণ্ড স্থির করা এবং জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা। একইসাথে, মজুরি নির্ধারণ পদ্ধতি উন্নয়ন, বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও

কাঠামোগত সংস্কারে স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন করা। জাতীয় ও খাতভিত্তিক মজুরি তিন বছর পর পর মূল্যায়নের মাধ্যমে বৃদ্ধি এবং মর্যাদাপূর্ণ মানদণ্ড নির্ধারণ করা।

৩। নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ:

শ্রমিকের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ এবং স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার আইনি অধিকার নিশ্চিত করা। খাত ও পেশাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করা। দুর্ঘটনায় বা অবহেলাজনিত নিহত-আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড পুনর্মূল্যায়ন করা। একইসাথে, মর্যাদাপূর্ণ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতে মানদণ্ড ও পরিমাণ নির্দিষ্ট করা।

৪। শ্রমিকসহ শ্রমশক্তি নিবন্ধন ব্যবস্থা ও তথ্যভাণ্ডার গঠন:

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, স্ব-নিয়োজিতসহ সকল শ্রমিকের পেশাগত ও আইনি সুরক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রমিকের স্বীকৃতি, পরিচয়পত্র প্রদান ও নিবন্ধনের ব্যবস্থা নেয়া। এ লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক জরুরি ভিত্তিতে 'জাতীয় শ্রমশক্তি নিবন্ধন ব্যবস্থা ও তথ্য ভাণ্ডার' গড়ে তোলা।

৫। সংগঠন ও দরকষাকষি অধিকার:

সংগঠিত হবার অধিকার নিশ্চিতে রাষ্ট্র কর্তৃক মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাংবিধানিক অঙ্গীকারকে কার্যকর করা। ট্রেড ইউনিয়ন শর্ত শিথিল করে সংগঠন করার অধিকার বিস্তৃত করা। দরকষাকষির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক কাঠামো নিশ্চিত করা।

৬। জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্ত অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষম-তা-সমন্বয় জোরদারে সরকারি (শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শ্রম শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন-আইআরআই, নসট্রি, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান) ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বত্র জবাবদিহিতা, গণতান্ত্রিক চর্চা, স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় সংস্কার করা।

৭। স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন:

জবাবদিহিমূলক শ্রম প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতের লক্ষ্যে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন প্রয়োজন। স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে অবিলম্বে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি 'জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম' গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৮। কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ:

দেশে বিরাজমান বেকারত্ব রোধ এবং দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রসারে রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা। একই সাথে, অটোমেশন ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং উদ্ভূত সুযোগ কাজে লাগাতে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরির লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পথনকশা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া; এক্ষেত্রে, শ্রমের যথাযথ ব্যবহার, উৎপাদনশীল যুব শ্রমশক্তি ও উদ্যোক্তা তৈরিতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

৯। সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা:

সকল শ্রমিকের সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার প্রাপ্তির (কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, মৃত্যু, কর্মঅক্ষমতা, অসুস্থতা-অবসর, মাতৃত্বকালীন সুবিধা বা যেকোনো প্রতিকূল অবস্থা) সুযোগ নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা। শ্রমিকদের সমস্যার ভিন্নতা ভিত্তিতে কোনও না কোনও নিরাপত্তা স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এক্ষেত্রে আইএলও'র জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রবর্তন, সামাজিক বিমা ব্যবস্থা প্রবর্তনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১০। সম-অধিকার নিশ্চিত এবং সহিংসতা ও বৈষম্য দূরীকরণ:

নারী-পুরুষ, অন্যান্য লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠীভেদে মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াসহ শ্রমখাতের সর্বত্র বৈষম্য নয়-সমঅধিকার নিশ্চিতে রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ করা। আর, পাহাড়ে-সমতলে আদিবাসী ও বহুজাতির জনগোষ্ঠীর শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।

১১। যৌন হয়রানিসহ সকল ধরনের হয়রানি ও সহিংসতা প্রতিরোধ:

যৌন হয়রানিসহ সকল ধরনের হয়রানি ও সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতে রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ২০০৯ সালের হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতা বিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন করা; একইসাথে, জরুরিভাবে অভিযোগ সেল ও নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা। আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুসমর্থন করা।

১২। সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা:

সকল নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি সবেতনে ৬ মাস করার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারের সহায়তা প্রদান ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ স্কিম প্রণয়ন করা।

৩। শিশু-কিশোর ও জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধ ও নিরাপত্তা:

শিশু-কিশোর ও জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধে সরকার কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আগাম দাদন দেয়াসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে জবরদস্তিমূলক শ্রমের সকল পথ বন্ধ করায় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।

১৪। সুসমন্বিত শিল্প সম্পর্ক ও সামাজিক সংলাপ চর্চা:

সুসমন্বিত-সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে শ্রমিক-নিয়োগকারীসহ সকল পক্ষের দায়িত্বশীল আচরণ এবং কার্যকর সংলাপের কাঠামো ও প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

১৫। সুষ্ঠুশ্রম আদালত, ন্যায়বিচার ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা:

শ্রমিকের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি, মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি ও অযথা হয়রানি বন্ধে সরকার কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া। আইনের অধিকার লঙ্ঘন প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও কাঠামো নিশ্চিত করা। বিরোধ নিষ্পত্তি ও আইনানুগ প্রাপ্য অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ ও বলপ্রয়োগ বন্ধ করা। বিভিন্ন সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে যে সকল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও শ্রমিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে তা দ্রুত পর্যালোচনা সাপেক্ষে বাতিল করা।

১৬। মর্যাদাপূর্ণ-হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ ও আদালতে বাংলাভাষার প্রচলন করা:

মর্যাদাপূর্ণ শ্রমপরিবেশের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রেণি, লিঙ্গ, বর্ণ, জাতিভেদে অবমাননাকর ও অমর্যাদাকার ক্ষমতাকেন্দ্রিক ভাষা ব্যবহার রোধ করা। শ্রম আইনে ‘মহিলা’শব্দের পরিবর্তে ‘নারী’ ব্যবহার করা। কর্মপরিবেশে শ্রেণিক্ষমতায় তুই-তুমি সম্বোধন চর্চা বন্ধ করা। শ্রম আদালতের শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল থেকে হাইকোর্ট ও অ্যাপিলেট ডিভিশন পর্যন্ত সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রচলন করা।

১৭। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বে নারী-পুরুষ শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ:

শ্রম সংশ্লিষ্ট নীতি, বাৎসরিক বাজেট এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জনসহ বিভিন্ন জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ-বাস্তবায়নে নারী-পুরুষ উভয় শ্রমিক ও তার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; এবং জাতীয় সংসদসহ সকল প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে/ ফোরামে সংঘবদ্ধ শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতে সরকারের নীতি প্রণয়ন করা।

১৮। আপদকালীন তহবিল গড়ে তোলা ও বিদ্যমান তহবিলের স্বচ্ছতা:

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, ব্যবসায় আকস্মিক সংকটের কারণে শ্রমিকের মজুরি ও অন্যান্য প্রাপ্তি লাভ এবং উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক জরুরি ও আপদকালীন তহবিল গঠন করা। এছাড়া, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, কেন্দ্রীয় তহবিলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

১৯। শ্রমিক ইতিহাস-ঐতিহাসিক স্থান সুরক্ষা ও স্মৃতিসৌধ গঠন:

শ্রমিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক স্থান সুরক্ষা, স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর গঠনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যক্রম, শিক্ষা কোর্স ও মিডিয়ায় শ্রমের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও শ্রমিকের জীবনগাঁথা মর্যাদাপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা।

২০। শহীদ স্বীকৃতি, পুনর্বাসন, চিকিৎসা ও ন্যায়বিচারঃ

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান ও শ্রমিক আন্দোলনে নিহত সকল শ্রমিককে রাষ্ট্র কর্তৃক শহীদের স্বীকৃতি প্রদান করা। এছাড়া, শ্রমখাতে দুর্ঘটনা বা অবহেলাজনিত নিহতদের ক্ষতিপূরণ ও আহতদের পুনর্বাসন, চিকিৎসার জন্য রাষ্ট্রীয় যথাযথ নীতি গ্রহণ করা। একইসাথে, রানাপ্লাজা, তাজরিন গার্মেন্টস, এবং হাসেম ফুডসহ উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনাসমূহের ক্ষেত্রে দায়ীদের দ্রুত বিচার ও শাস্তির আওতায় আনা।

২। টেকসই শিল্পায়ন, উৎপাদনশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নঃ

জাতীয় শিল্পের করা বিকাশ, শিল্পায়ন ও টেকসই ও শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠা, উদ্যোক্তা গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক ও পরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং সামাজিক ব্যবসার প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্য আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্ক ফোর্স গঠন এবং শিল্প ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা।

২২। শিল্পাঞ্চল ও শ্রমঘন এলাকায় নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করাঃ

শ্রমিক ও তার পরিবারের জন্য শিল্পাঞ্চলে নাগরিক সুবিধা ও সেবা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে এই সুবিধা (শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যবীমা, সেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, গ্যাস বিদ্যুৎ-পানির যথাযথ সরবরাহ ও অন্যান্য) যাতে শ্রমজীবী মানুষের জন্য পরিচালিত হয় তার উদ্যোগ গ্রহণ করা, যাতে বাংলাদেশ সার্বিকভাবে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে।

২৩। জলবায়ু ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বিবেচনায় কর্মপরিবেশ গঠনঃ

জলবায়ু ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বিবেচনায় শ্রম পরিবেশ গড়ে তোলায় সরকার ভূমিকা নেবে। এ সংক্রান্ত দেশীয় পরিবেশ বাস্তবতা এবং আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা পরিপালনে মনোযোগী হওয়া।

২৪। অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করাঃ

সকল অভিবাসী শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিত ও অভিবাসন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ লক্ষ্যে, অভিবাসী শ্রমিকের স্বীকৃতি, সংগঠিত হওয়া এবং প্রতিনিধিত্বের অধিকার নিশ্চিত করা। একইসাথে দেশীয়-আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার করা।

২৫। শ্রম বিষয়ক গবেষণা ও জরিপঃ

শ্রমশক্তি জরিপ, শ্রম সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সরকার কর্তৃক আলাদা বিভাগ গঠন করা।

সংযুক্তি- ২:

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ- স্কপ-এর ৯ দফার মূল বিষয়বস্তু:

১। শ্রম আইন সংক্রান্ত

আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর আলোকে স্বাধীনভাবে সংগঠন, পছন্দমত নেতা নির্বাচন, কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন এবং দরকষাকষি করার অধিকার দিতে হবে। এক দেশে একাধিক প্রকারের আইন রহিত করে একই আইনের আওতায় ইপিজেড, স্পেশাল ইকোনমিক জোনসহ সকল ক্ষেত্রে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে। শ্রম আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে স্কপ এর সংশোধনী গ্রহণ করতে হবে।

২। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংক্রান্ত

শ্রমিকদের সংগঠন করার এবং দাবি উত্থাপন ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা দূর করতে হবে। সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত কারণ ছাড়া শিল্প কারখানায় লে অফ, ছাঁটাই করা চলবে না। পাওনা পরিশোধ না করে জোরপূর্বক সন্ত্রাসী কায়দায় ইস্তফা লিখিয়ে নেওয়া এবং মনগড়া কাগজপত্র দিয়ে সরকারি দফতরে ভুল তথ্য প্রদান, শ্রমিকদের দমন করতে পেশী শক্তির ব্যবহার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ দিয়ে চাপ প্রয়োগ ও হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক, সরকারি, বেসরকারি সকল শ্রমিকের রেজিস্ট্রেশন এবং ডাটাবেজ এর ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দিতে হবে।

৩। ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ

মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে।

এছাড়া, বাজার দর, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা, শিল্পের প্রকৃত সক্ষমতা, মাথাপিছু জাতীয় আয় বিবেচনায় নিয়ে মালিকানা নির্বিশেষে সকল শ্রমিকের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে হবে। মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমুল্য বিবেচনা করে মজুরি স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে মহার্ঘভাতা চালু করতে হবে।

৪। রাষ্ট্রীয় খাত রক্ষা

বন্ধকৃত ২৫টি রাষ্ট্রীয় পাটকল, চিনিকলসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চালু করতে হবে। লোকসানের জন্য বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ-এর পরিকল্পনা,

মন্ত্রণালয় ও কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও অপচয় এবং ভুল পরিকল্পনার জন্য দায়ীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ এবং তাদেরকে সম্পৃক্ত করে পাটকল, চিনি কলসহ অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা পরিকল্পিতভাবে আধুনিকায়ন করতে হবে। ব্যাংক-বীমাসহ সরকারি-বেসরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত সকল প্রতিষ্ঠানে আউটসোর্সিং বন্ধ করতে হবে।

৫। শ্রমিকের রেশন, আবাসন ও সুরক্ষা

গ্রাম শহরের শ্রমজীবী মানুষের জন্য ভর্তুকিমূল্যে রেশন, আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি বেসরকারি সকল শ্রমিক কর্মচারীর জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে। নারী শ্রমিকদের জন্য শিল্প ও শিল্পাঞ্চলভিত্তিক ডরমিটরি, ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপন করতে হবে। প্রতিটি শিল্পাঞ্চলে শ্রমজীবীদের জন্য হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে। করোনার মত যে কোনও মহামারিতে শ্রমিকদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মহীন ও কর্মচ্যুত বেকার শ্রমিকদের বেকার ভাতা দিতে হবে।

৬। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। ক্ষুদ্র শিল্প এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক যেমন- নির্মাণ, দোকান কর্মচারী, হোটেল-পর্যটন কর্মী, গৃহকর্মী, বিপণন কর্মী, চাতাল, করাত কল, পাদুকা, সেলুন, পার্লার, হকার, বেকারি, পুস্তক বাঁধাই, মুদ্রণ শ্রমিক, দর্জি, হোম বেজড ওয়ার্কার, লোকাল গার্মেন্টস কর্মী, রাইড শেয়ার, রিকশা, ভ্যান, ব্যাটারি রিকশা, ইজি বাইক, ব্যাক্তিগত গাড়ির চালক, স্বকর্মে নিয়োজিত শ্রমজীবী, চা শ্রমিকসহ বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার আইনি অধিকার সম্প্রসারিত করতে হবে। পুনর্বাসন ছাড়া রিক্সা, ব্যাটারি রিক্সা, ইজি বাইক, হকার সহ স্ব-নিয়োজিত শ্রমিক উচ্ছেদ করা চলবে না।

সড়ক পরিবহণ এবং নৌ পরিবহণসহ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র প্রদানসহ যৌক্তিক ও ন্যায্য দাবিসমূহ পূরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিআরটিএ-এর দুর্নীতি হয়রানি বন্ধ করে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে।

৭। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শ্রম কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের পাশপাশি দুর্ঘটনায় আহত নিহতদের নির্ভরশীল পোষ্যদের কর্মসংস্থান করতে হবে। অবহেলাজনিত কারণে দুর্ঘটনা হলে মালিকের সর্বোচ্চ শাস্তি, জরিমানার ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কর্তব্যে অবহেলার জন্য শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৮। শিল্প পুলিশ এবং শ্রমিক নিপীড়ন সংক্রান্ত

শিল্প প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন এবং শিল্প সম্পর্ক বিষয়ে পুলিশের হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। মালিকদের স্বার্থে শ্রমিক নিপীড়নে শিল্প পুলিশকে ব্যবহার করা চলবে না।

৯। প্রবাসী শ্রমিক সংক্রান্ত

প্রবাস গমনেচ্ছুদের সহজ শর্তে ঋণ, ফিরে আসা শ্রমিকদের পুনর্বাসন, প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী ও আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে দায়িত্ব নিতে হবে। প্রবাসী শ্রমিকদের অভিবাসন ব্যয় কমাতে হবে। প্রবাসী শ্রমিকদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন ও হয়রানি বন্ধে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

সংযুক্তি- ৩।

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম- এসএনএফ-এর সুপারিশমালা

বাংলাদেশ একটি শ্রম ঘন দেশ। সর্বশেষ ২০২২ সালের শ্রম জরিপের তথ্যমতে দেশে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৭৩.০৫ মিলিয়ন যার মধ্যে কর্মে নিয়োজিত আছে ৭০.৪৭ মিলিয়ন। এই শ্রম শক্তির মধ্যে সবচেয়ে বেশি যুক্ত আছে কৃষিতে ৩১.৯৮ মিলিয়ন, সেবা খাতে ২৬.৫২ মিলিয়ন এবং শিল্প খাতে ১১.৯৭ মিলিয়ন। বিপুল এই শ্রম শক্তিই হলো দেশের অর্থনীতির ভিত্তি। কিন্তু শ্রম শক্তির সাথে যুক্ত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বরাবরই উপেক্ষিত রয়েছে। কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা এবং শ্রমিকের মৃত্যু ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। ২০১২ এবং ২০১৩ সালে পরপর দুই বছরে দুটি কর্ম-দুর্ঘটনায় হাজার হাজার শ্রমিকের মৃত্যুর পর শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র নিরাপত্তা নিয়ে কিছুটা উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক খাতের থেকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন ২০২৫ সালে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি পরিবহন খাতে ৩৮৫ জন শ্রমিক মারা যায় এছাড়া নির্মাণ খাতে ১২০ জন শ্রমিক মারা যায়। সড়ক দুর্ঘটনা, বিদ্যুতায়িত হওয়া, উপর থেকে পড়ে যাওয়া, ভারী বস্তুর আঘাত এবং বিস্ফোরণ বা আগুনে পুড়ে যাওয়াই দুর্ঘটনায় মৃত্যুর প্রধান কারণ। প্রতিবছর দুর্ঘটনার বাহিরে হাজার হাজার শ্রমিক বিভিন্ন প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে বেশ কিছু রয়েছে পেশাগত ব্যাধি। আইএলও এর তথ্যানুসারে অসুস্থতায় প্রতিবছর বিশ্বে ২.৩ মিলিয়ন শ্রমিক মারা যায়। প্রতিদিন পেশাগত রোগে ৬৪০০ জন শ্রমিক মারা যায়। আইএলও তথ্যমতে নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে এই হার বেশি। কারণ, এই দেশগুলোতে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনগুলো ভালোভাবে প্রয়োগ করা হয় না। তাই পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা এখন সময়ের দাবি।

নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করা এবং কর্মক্ষেত্রের দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও আহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনসহ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তি ও তাদের সহায়তাকল্পে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের মানবাধিকার সংগঠন, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও পরিবেশ নিয়ে কর্মরত সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম গঠিত ।

শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

১. অবিলম্বে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক আইএলও কনভেনশন ১৫৫ ও ১৮৭ সরকার কর্তৃক অনুসমর্থন করা।

২. কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মান উন্নয়নে পরিদর্শন ব্যবস্থা যুগোপযোগী করা।

৩. শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৪. স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও বিতরণ করা।

৫. শ্রম সংক্রান্ত ত্রিপক্ষীয় সকল কাঠামোকে কার্যকর ও শক্তিশালী করতে হবে এবং সকল অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করা।

৬. আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

৭. নির্মাণ, রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্রসমূহ পরিদর্শনে দেশব্যাপি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা বা ঝটিকা পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা।

৮. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি হাসপাতালে বিশেষ ইউনিট ও বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সকল শ্রমিককে বীমার আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৯. কর্মক্ষেত্রের সকল দুর্ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে দুর্ঘটনার অবহেলাজনিত বা অন্যান্য সকল কারণ নির্ণয়সহ তদন্ত রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করা।

১০. শ্রমিকসহ সকল মানুষের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১১. প্রতিটি শিল্প কারখানায় "শ্রমিক কল্যাণ তহবিল" গঠন ও এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১২. আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে মিল রেখে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক একক ও সেক্টর ভিত্তিক জাতীয় মানদণ্ড ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

১৩. এ.আই, ডিজিটাইলাইজেশন, অনলাইন প্লাটফর্ম, অতিমারী- কোভিডসহ যেকোন সংক্রামক রোগ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদ করা।

১৪. জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেফটি কাউন্সিলকে কার্যকর করার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনে সেক্টরভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে যুক্ত করা।

১৫. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, আইন ও বিধিমালা, কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) বাস্তবায়ন ও তদারকি করার জন্য অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেলথ এডমিনিস্ট্রেশন প্রতিষ্ঠা করা।

১৬. দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, বয়লার অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১৭. মেডিক্যাল শিক্ষায় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। চিকিৎসক, নার্স ও মেডিক্যাল টেশনিশিয়ানদের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা একাডেমিক কারিকুলাম যুক্ত করা ।

১৮. শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলিকে আধুনিকায়ন করা। এবং চিকিৎসক, জনবল ও যন্ত্রপাতি প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, পেশাগত রোগব্যাধি ও কাউন্সেলিং চিকিৎসা এবং ন্যায্য মূল্যে ঔষধের ব্যবস্থা করা ।

১৯. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউটের অধীনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা এবং কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার গঠন করা।

২০. শ্রমিকদের পেশাগত রোগ চিহ্নিত করার জন্য একটি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা।

যোগাযোগঃ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স

(এলায়েন্স সচিবালয়)

ই-মেইলঃ **bils@citech.net**